WBCS BENGALI COMPULSORY PAPER.COM

1ST TO 28 APRIL

আধিপত্যের শিক্ষা

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান প্রশ্ন তুলেছেন, নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে নানা মহল থেকে এত আপত্তি কেন? নতুন নীতি বলে কথা, তাতে কত ভাল হবে, মাতৃভাষায় লেখাপড়ার প্রসার ঘটবে, ছেলেমেয়েদের দক্ষতা বাড়বে, তারা কাজের সুযোগ পাবে, রাজ্যের সরকার কি তা চায় না? প্রতিবাদী শিক্ষক সংগঠন বা অন্য যারা বিরোধিতা করছে তারাও কি চায় না? ব্যাপারটা কী? তাঁর প্রশ্নে যেন মিশে আছে কিছু বিস্ময়, কিছু ক্ষোভও। পশ্চিমবঙ্গের লোকেরা নিজেদের ভাল চায় না, তাই বিস্ময়; কেন্দ্র যা করে এই রাজ্য তাতেই বাদ সাধে, তাই ক্ষোভ। বুঝতে অসুবিধা হয় না, এ নিয়ে তিনি বা তাঁরা, মানে কেন্দ্রীয় সরকার তথা শাসক দলের কর্তাদের মনে একটা অসন্তোষ এবং বিরক্তি পোষা আছে, কলকাতা সফরে এসে সেই মনোভাবটি মন্ত্রিবর জানিয়ে দিয়ে গেলেন। ‘বেয়াড়া পশ্চিমবঙ্গ’ সম্পর্কে ভালমন্দ দু’কথা বলে যাওয়ার জন্য হয়তো বড়কর্তাদের কাছে তাঁর কিছু নম্বর বাড়বে।

শিক্ষামন্ত্রী স্থূলে ভুল করছেন। করারই কথা, কারণ যে প্রশ্ন তিনি তুলেছেন তার ঠিক উত্তরটা তাঁকে শেখানো হয়নি, সেই উত্তরে পৌঁছতে গেলে যে ভাবে ভাবতে হয়, সেই ভাবনা তিনি বা তাঁর বড়কর্তারা ভাবেননি। তাঁরা নিরঙ্কুশ আধিপত্য ছাড়া কিছু বোঝেন না। তাই এই সহজ এবং মৌলিক সত্যটা তাঁরা জানেন না যে, জাতীয় শিক্ষানীতি বস্তুটাই একটা আধিপত্যবাদের প্রকরণ। রাজ্যের উপর কেন্দ্রের আধিপত্য। মন্ত্রিমশাই শিক্ষানীতির গুণ গেয়েছেন। গাইতেই পারেন। এই নীতির নানা দিক, নানা নির্দেশ। তাদের কিছু ভাল, কিছু ভাল নয়। কিন্তু সেটা পরের কথা। প্রথম কথা হল, শিক্ষার নীতি কী হবে, কী ভাবে সেই নীতির রূপায়ণ হবে, সেটা কেন্দ্রীয় সরকার ঠিক করবে কেন? শিক্ষার ব্যাপারটা যত দূর সম্ভব শিক্ষক ও শিক্ষাবিদদের হাতে ছেড়ে দেওয়া বিধেয়। সমন্বয় বা সামগ্রিক তদারকির প্রয়োজনে এই বিষয়ে সরকারি স্তরে যেটুকু যা করার, সেটা একেবারেই রাজ্য স্তরে করণীয়। সেটাই যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার স্বাভাবিক নীতি। পশ্চিমবঙ্গ বা তামিলনাড়ুর মতো রাজ্যে জাতীয় শিক্ষানীতি নিয়ে যে অসন্তোষ ও আপত্তি, তার মূল কারণ এটাই।

শিক্ষামন্ত্রী বা তাঁর সহমর্মীরা বলতে পারেন, ভারতীয় সংবিধানে শিক্ষা রাজ্য তালিকায় নেই, আছে যুগ্ম তালিকায়, তা হলে কেন্দ্রীয় শিক্ষানীতি রচনা এবং রাজ্যগুলোকে তা মানতে বলার মধ্যে দোষের কী আছে? আইনের হিসাবে কোনও দোষ নেই। কিন্তু আইনের প্রশ্ন এখানে হচ্ছে না, প্রশ্নটা নৈতিকতার। যুক্তরাষ্ট্রীয় নৈতিকতা। এটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ যে, শিক্ষা সংবিধানের রাজ্য তালিকাতেই ছিল, জরুরি অবস্থার সময় তাকে যুগ্ম তালিকায় ঠাঁইনাড়া করা হয়। এটা ছিল, স্পষ্টতই, কেন্দ্রীয় আধিপত্য বাড়ানোর একটা উদ্যোগ। লক্ষণীয়, পরবর্তী কালে কোনও সরকারই এই উদ্যোগ প্রত্যাহার করেনি, বরং এটিকে রাজ্যের উপর কেন্দ্রের ক্ষমতা চাপিয়ে দেওয়ার প্রকরণ হিসাবে কাজে লাগিয়েছে— এর আগের জাতীয় শিক্ষানীতি রচিত হয়েছিল ১৯৮৬ সালে, রাজীব গান্ধীর জমানায়। সেই যুক্তরাষ্ট্র-বিরোধী কেন্দ্রমুখী আধিপত্যবাদ সমানে চলছে বললে কম বলা হবে, মোদী জমানায় তাকে আরও অনেক জোরদার রূপ দেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ আপত্তি করছে, তামিলনাড়ু তো করছেই। তামিলনাড়ু এক বছরের মধ্যে তার নিজস্ব শিক্ষানীতি ঘোষণা করবে, এই বক্তব্য জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী। তবে উল্লেখযোগ্য যে, এমন কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া অধিকাংশ রাজ্যই এই আধিপত্যবাদকে মেনে নিচ্ছে। দলীয় সংহতি এবং স্বার্থের পায়ে যুক্তরাষ্ট্রের অধিকারকে বলি দেওয়া নিয়ে দেশব্যাপী বিশেষ মাথাব্যথা দেখা যাচ্ছে না। প্রকৃত বিপদটি এখানেই।

দুঃসময়

খারাপ খবর সচরাচর একা আসে না। ভোগ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি, এবং শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির শ্লথ গতির খবরও একই সঙ্গে পাওয়া গেল। তার কয়েক দিনের মধ্যেই জানা গেল যে, পাইকারি মূল্যসূচকের নিরিখে মূল্যস্ফীতিও বেলাগাম হয়েছে। ভারতীয় রিজ়ার্ভ ব্যাঙ্কের মতে, ভোগ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির গ্রহণযোগ্য হার হল দুই থেকে ছয় শতাংশ। জানুয়ারি মাস থেকেই ভোগ্যপণ্যের মূল্যস্ফীতির হার ব্যাঙ্কের গ্রহণযোগ্য সীমার উপরে ছিল। মার্চ মাসে তা পৌঁছে গেল প্রায় সাত শতাংশে। পেট্রোলিয়ামের দাম নয়, এই মূল্যবৃদ্ধির পিছনে সবচেয়ে বড় অবদান খাদ্যপণ্যের দামের। খাদ্যপণ্যের মূল্যসূচক কনজ়িউমার ফুড প্রাইস ইনডেক্স মার্চে বৃদ্ধি পেয়েছে ৭.৬৮ শতাংশ। ফেব্রুয়ারিতে এই বৃদ্ধির হার ছিল ৫.৮৫ শতাংশ। ভোজ্য তেল থেকে আনাজ, মাছ-মাংস, সবের দামই উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে। পাইকারি মূল্যসূচকের নিরিখে মূল্যস্ফীতির হার মার্চে পৌঁছে গেল ১৪.৫৫ শতাংশে। এই বৃদ্ধির পিছনে বড় ভূমিকা রয়েছে আন্তর্জাতিক বাজারে

পেট্রোলিয়ামের মূল্যবৃদ্ধির। গত মার্চের তুলনায় এই মার্চে পেট্রোলিয়ামের মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে ৩৪.৫ শতাংশের বেশি। এই সংবাদটির পরতে পরতে লুকোনো রয়েছে বৃহত্তর দুঃসংবাদ— আগামী কয়েক মাসে সাধারণ ক্রেতার গায়ে মূল্যবৃদ্ধির আঁচ লাগতে চলেছে আরও বেশি করে, কারণ পেট্রোপণ্যের বর্ধিত দামের পুরো প্রভাব মার্চের ভোগ্যপণ্য সূচকে পড়েনি, তা পড়বে পরবর্তী মাসগুলিতে। পরিবহণের ব্যয়বৃদ্ধির ফলে খাদ্যপণ্য-সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় বিভিন্ন পণ্যের দামও বাড়বে। পাশাপাশি, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবে আন্তর্জাতিক বাজারে ‘কমোডিটি প্রাইস’ যে ভাবে বেড়েছে, তার প্রভাবও পড়বে।

মূল্যস্ফীতির এই আঁচ কার গায়ে লাগছে, তা অনুমান করা কঠিন নয়। মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্ত মানুষের আয় এখনও অতিমারির ধাক্কা সম্পূর্ণ সামলে উঠতে পারেনি। তার উপরে এই বেলাগাম মূল্যবৃদ্ধি তার ক্রয়ক্ষমতাকে আরও সঙ্কুচিত করেছে। সেই সঙ্কোচনের একটি প্রমাণ মিলবে শিল্প উৎপাদনের সূচকেও। মার্চ মাসে এই সূচকের বৃদ্ধির হার যৎসামান্য, কিন্তু তারই মধ্যে দু’টি ক্ষেত্রে উৎপাদনের সঙ্কোচন ঘটেছে। ক্ষেত্র দু’টি যথাক্রমে কনজ়িউমার ডিউরেবলস, এবং কনজ়িউমার নন-ডিউরেবলস। অর্থাৎ, যে ক্ষেত্রগুলির উৎপাদন সরাসরি সাধারণ ক্রেতার ক্রয়ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত, প্রত্যক্ষ ধাক্কা লেগেছে সেই ক্ষেত্রগুলিতেই। গ্রামাঞ্চলে মূল্যস্ফীতির ধাক্কা সচরাচর শহরের তুলনায় কম অনুভূত হয়, কারণ অন্তত খাদ্যের ক্ষেত্রে গ্রামে বাজার-বহির্ভূত একটি ব্যবস্থা কাজ করে। পরিসংখ্যান বলছে, গত এক বছরে গ্রামাঞ্চলেও ভোগ্যপণ্যের মূল্যস্ফীতির হার সরাসরি দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছে। ক্রেতার নাভিশ্বাস উঠছে। এই মূল্যস্ফীতির প্রভাব ক্রয়ক্ষমতার পথ বেয়ে অর্থব্যবস্থার বৃদ্ধির হারে স্বভাবতই প্রভাব ফেলবে।

WBCS BENGALI COMPULSORY PAPER.COM

সংযোগের ভাষা

অমিত শাহ এই বার খিড়কি বেছেছেন। অ-হিন্দিভাষী রাজ্যগুলির উপর হিন্দি ভাষাকে সরাসরি চাপিয়ে দেওয়া নয়, এই বার তিনি প্রস্তাব করেছেন, ইংরেজির বদলে দেশের বিভিন্ন অ-হিন্দিভাষী রাজ্যের মানুষ নিজেদের মধ্যে হিন্দিতে কথা বলুন। প্রস্তাবটির মধ্যে প্রত্যক্ষ গা-জোয়ারি নেই, বরং কৌশল আছে। সেই কারণেই এই প্রস্তাব সম্বন্ধে আরও বেশি সচেতন হওয়া বিধেয়। তিনি সরকারি ভাষা বিষয়ক সংসদীয় কমিটির প্রধান— সেই কমিটির বৈঠকেই প্রস্তাবটি পেশ করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। অর্থাৎ, এ নিছক কথার কথা নয়, সুচিন্তিত অবস্থান। একটি সাধারণ মঞ্চ থেকে কোনও সাধারণ লোক এই কথাগুলি বললে তার গুরুত্ব যতখানি হত, দেশের সর্বোচ্চ কমিটির প্রধান সেই কমিটির বৈঠকে একই কথা বললে তার গুরুত্ব বহু গুণ বেশি। অমিত শাহের মন্তব্যের কয়েকটি স্তর আছে। প্রথম স্তর হল, ইংরেজি ভাষাকে বর্জন করা। তাঁর ভাবটি এমন, যেন ইংরেজি ভারতীয় ভাষা নয়। সংবিধান ইংরেজিকে ভারতের ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে— হিন্দি বা অন্য কোনও ভাষার সঙ্গে ইংরেজির কোনও বিরোধ নেই। এই না-থাকা বিরোধ জাগিয়ে তোলা যে বিজেপির রাজনীতির অপরিহার্য অঙ্গ, এত দিনে এই কথাটি স্পষ্ট। এবং, অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো এই ভাষার বিরোধেও বিজেপির অবস্থানটি গোবলয়ের হিন্দিভাষী জনগোষ্ঠীর পক্ষে সুবিধাজনক। অ-হিন্দিভাষী রাজ্যগুলিতে এমনকি বিজেপির সহযোগী দলগুলিও যে অমিত শাহের এই বক্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়েছে, তা অকারণে নয়।

ভাষা হিসাবে হিন্দি গুরুত্বহীন, এমন দাবি করার প্রশ্ন নেই। সেই ভাষার বিকাশ ঘটলেও তাতে কেউ আপত্তি জানাবেন না। কিন্তু, যে দেশ ঐতিহাসিক ভাবে বহুভাষী, তার উপর কোনও কৌশলেই হিন্দি ভাষাকে চাপিয়ে দেওয়া যায় না। এমনকি, পারস্পরিক সংযোগের ভাষা হিসাবে ব্যবহারের আপাত-নিরীহ পরামর্শের মাধ্যমেও নয়। দেশের মানুষ কোন ভাষায় কথা বলবেন, দুই ভিন্ন ভাষাভাষী মানুষ পরস্পরের সঙ্গে কথা বলবেন কোন ভাষায়— সেই সিদ্ধান্ত একান্ত ভাবেই তাঁদের। তা প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক অধিকার। দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে অমিত শাহের কর্তব্য ছিল এই বহুত্বকে সম্মান করা। তিনি বলেছেন, হিন্দি ভাষাকে নমনীয়, গ্রহণশীল হতে হবে— আঞ্চলিক ভাষার শব্দ গ্রহণ করতে হবে। ভাষা বস্তুটি সততই চলমান, জৈব। যে কোনও ভাষাই গ্রহণ-বর্জনের মাধ্যমে এগিয়ে চলে— তার জন্য সরকারি ফরমানের প্রয়োজন পড়ে না। গ্রহণশীলতা অতি উত্তম ধর্ম— বিজেপির নেতারা বরং তা অভ্যাস করতে পারেন। তা হলে দেশের বহুত্বকে তাঁদের এতখানি অসহ্য ঠেকবে না।

অমিত শাহের প্রস্তাবটি এক দিকে নাগপুরের একশৈলিক আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, অন্য দিকে তিনি দলের হিন্দিভাষী ভোটারদেরও আশ্বস্ত করছেন যে, ইংরেজি রপ্ত করার প্রয়োজনীয়তাই আর থাকবে না। কিন্তু এই রাজনীতি আসলে দেশের তরুণ সমাজের এক মস্ত ক্ষতি করতে পারে। ইংরেজি ভাষাটি বর্তমান বিশ্বে অনন্য— আর কোনও ভাষা এমন ভাবে বৈশ্বিক হতে পারেনি। ফলে, আন্তর্জাতিক কাজের বাজারে নিজেদের জায়গা করে নিতে চাইলে এই ভাষাটিকে পরিহার করা অসম্ভব। বস্তুত, ইংরেজিতে দখল থাকার কারণেই বিশ্বায়ন-পরবর্তী পর্যায়ে ভারত পরিষেবা ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে উঠতে পেরেছিল। জার্মানি থেকে চিন, নিজেদের ভাষা নিয়ে অতীব গর্বিত বহু দেশও ইংরেজির এই গুরুত্ব অনুধাবন করেছে, এবং সেই

ভাষার শিক্ষার উপর জোর দিয়েছে। ইংরেজি ভাষাকে ভালবেসে নয়, একান্তই নিজেদের স্বার্থে। সঙ্কীর্ণ রাজনীতির কথা ভেবে ভারতকে ভিন্ন পথে চালনা করার বাসনাটি দেশের তরুণদের স্বার্থরক্ষা করবে না।

উপেক্ষিতা

চিকিৎসা পরিষেবার সকল ধারা-উপধারার মধ্যে বিশেষ গুরুত্ব পায় প্রসূতি ও নবজাতকের স্বাস্থ্যসুরক্ষা। মানবিক কারণে তো বটেই, তা ছাড়াও প্রসূতি ও নবজাতকের মৃত্যুহার মানব-উন্নয়নের সূচক, তাই এক অর্থে তা দেশের পরিচয়। সে কাজটি এ রাজ্যে যথাযথ গুরুত্ব পাচ্ছে কি না, সে সংশয় দেখা দিল দু'টি সাম্প্রতিক সংবাদে। এক, এ রাজ্যে কোভিডকালে বেড়েছে প্রসূতিমৃত্যু। দুই, সিজ়ার করে প্রসবের সংখ্যা প্রত্যাশার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। দু'টি ক্ষেত্রেই চিকিৎসায় ব্যবস্থাপনার ত্রুটিগুলি প্রধান কারণ হয়ে দেখা দিচ্ছে। অর্থাৎ, সময় থাকতে সতর্ক হলে, যথাযথ পরিকল্পনা করলে অনেক প্রাণ বাঁচত, অনেক ঝুঁকি এড়ানো যেত। এ কথাটি কোভিডে প্রসূতিমৃত্যুর ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য। কোভিড নিয়ন্ত্রণে আশাকর্মীদের নিয়োগ করার সরকারি সিদ্ধান্তের দাম এ রাজ্যের মেয়েরা দিলেন প্রাণের মূল্যে। প্রসূতিদের পরিষেবা ও শিশুদের টিকাদানের কাজ কার্যত বন্ধ করে আশাকর্মীরা বাড়ি-বাড়ি কোভিড-আক্রান্তদের নজরদারি ও সহায়তার কাজ করেছেন। তার উপর অনেক হাসপাতাল 'কোভিড হাসপাতাল' বলে ঘোষিত হওয়ায় প্রসূতিদের স্থান দিতে চায়নি। প্রসূতিদের জন্য নির্দিষ্ট 'নিশ্চয়যান' কোভিড রোগী বহনে নিযুক্ত হয়েছে। এ সবের প্রত্যাশিত ফলই মিলেছে— ২০২০-২১ সালে মোট প্রসূতিমৃত্যুর সংখ্যা ১২০৬, ২০২১-২২ সালে ১১২৯। যে রাজ্যে স্বাস্থ্যকর্তাদের লক্ষ্য বছরে মোট প্রসূতিমৃত্যুর সংখ্যা আটশোর মধ্যে সীমিত রাখা, সেখানে এই সংখ্যা নিঃসন্দেহে নিরাশাজনক।

অথচ, অতিমারির মোকাবিলা করতে গিয়ে নিয়মিত পরিষেবায় ফাঁক পড়ে গেলে যে তা মেয়েদের স্বাস্থ্যে প্রভাব ফেলতে পারে, তার আগাম সতর্কতা ছিল। রাষ্ট্রপুঞ্জের বিশেষজ্ঞরা কোভিড অতিমারির শুরুতেই মনে করিয়েছিলেন আফ্রিকায় ইবোলা মহামারির (২০১৪-১৬) কথা। সে বার ইবোলা ভাইরাসে ১১ হাজার মানুষ মারা গিয়েছিলেন, কিন্তু হাসপাতালে স্থান না হওয়ায় বাড়িতে প্রসবের কারণে এক লক্ষ কুড়ি হাজার প্রসূতিমৃত্যু ঘটেছিল। টিকাকরণ ব্যাহত হওয়ায় বহু গুণ বেড়ে গিয়েছিল মাম্পস, হাম, রুবেলা। মা ও শিশুর জীবনে এই বিপর্যয় ঘটতে পারে জেনেও প্রতিরোধের চেষ্টা করা হয়নি, সেই জন্যই তা ঘটেছে। এ রাজ্যেও কোভিড অতিমারিতে নানা স্তরের হাসপাতাল সংক্রমণের ভয় দেখিয়ে আসন্নপ্রসবাদের ফিরিয়েছে। ফলে মা-শিশুর প্রাণসংশয় দেখা দিয়েছে, এমনকি মৃত্যুও ঘটেছে। যে ঝুঁকি নিবারণ করা অসাধ্য নয়, তা-ও মেয়েদের প্রাণ কেড়ে নিচ্ছে। ভুক্তভোগীদের অভিযোগ, এ রাজ্যে চিকিৎসাব্যবস্থা আসলে চিকিৎসক ও আধিকারিকদের সুবিধা অনুসারে পরিকল্পিত— মেয়েদের প্রয়োজন সেই ব্যবস্থায় যথেষ্ট গুরুত্ব পায় না।

তারই প্রতিফলন মেলে অতিরিক্ত সিজ়ারিয়ান অস্ত্রোপচারের সংখ্যায়। বেসরকারি ক্ষেত্রে স্বাভাবিক প্রসবের চাইতে সিজ়ারিয়ান প্রসবের সংখ্যা বহু দিন থেকেই বেশি। এখন সরকারি হাসপাতালেও দশটি প্রসবের মধ্যে চারটি সিজ়ার। সিজ়ার সংখ্যায় এ রাজ্য ভারতের শীর্ষে। চিকিৎসককুলের মতে, এর অন্যতম কারণ সময়ের অভাব— স্বাভাবিক প্রসব করানোর মতো সময় নেই চিকিৎসকদের। কোনও সভ্য দেশে চিকিৎসকের সুবিধা অনুযায়ী চিকিৎসা হয় কি? আবার, সরকারের অর্থ অকুলান বলে সিজ়ারিয়ান অস্ত্রোপচারে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টাও বিভ্রান্তিকর। সরকারি হাসপাতালে সিজ়ার 'অডিট' নাহয় শুরু হয়েছে সম্প্রতি। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়, বেসরকারি হাসপাতালে কী করে সিজ়ারের সংখ্যা নিয়ন্ত্রিত হবে? কী করে অকারণে অস্ত্রোপচার থেকে সুরক্ষিত হবে মেয়েরা, তা স্থির হবে কী করে? মেয়েদের প্রয়োজনকে কেন্দ্রে রেখে চিকিৎসা তথা স্বাস্থ্যব্যবস্থার পরিকল্পনা কি এতই কঠিন?

তারের বিপদ

জঙ্গলে ঢেকেছে শহর কলকাতা। তারের জঙ্গল। বস্তুত, আকাশের দিকে তাকালেই কুণ্ডলীকৃত তার দৃষ্টিপথে বাধার সৃষ্টি করে— এমন একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে মহানগরীর। গত কয়েক বছরে শহরে আমপান, ইয়াসের মতো ঘূর্ণিঝড় হানা দিয়েছে। একাধিক বড় কালবৈশাখী ঘটেছে। তার ছিঁড়ে নাগরিক দুর্ভোগ, এমনকি প্রাণহানিও হয়েছে। অথচ, মৃত্যুফাঁদ সরেনি। বিশেষত, বস্তি এলাকায় তারের জট মাথায় নিয়েই বিপদের প্রহর গোনেন বাসিন্দারা। সেই বিপদের কথা মাথায় রেখে বস্তির এ-হেন পরিস্থিতি নিয়ে সমীক্ষার উদ্যোগ করেছে কলকাতা পুরসভা। এই কাজে সহায়তা করবে দমকল, বিপর্যয় মোকাবিলা দফতর এবং সিইএসসি। কলকাতা শহরের নথিভুক্ত এবং অ-নথিভুক্ত বস্তির সংখ্যা বড় কম নয়। এবং শহরের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মানুষ বস্তিতে বসবাস করেন। দমকলের দীর্ঘ দিনের অভিযোগ, বৃষ্টির জল তারের স্তূপ বেয়ে বিদ্যুতের মিটার ঘরে ঢুকে অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি

করে। সঙ্কীর্ণ গলি-পথের ঘিঞ্জি বস্তি এলাকায় অগ্নিকাণ্ড ঘটলে তা নিয়ন্ত্রণ করা ক্ষেত্রবিশেষে দুরূহ হয়ে পড়ে। জীবনহানি ঘটার আশঙ্কাও পুরোমাত্রায় থেকে যায়। সুতরাং এই বিপদ থেকে শহরকে বাঁচতে অবিলম্বে পদক্ষেপ করা প্রয়োজন ছিল।

কিন্তু এই মুহূর্তে সমীক্ষার প্রয়োজন কী? সমীক্ষা সাধারণত করা হয় প্রাথমিক পর্যায়ে, কোনও বিপদের ধার ও ভার বুঝতে এবং সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা করতে। কলকাতায় তারের বিপদ প্রতিনিয়ত নাগরিকের চোখের সামনে দোদুল্যমান। এখন প্রয়োজন, অবিলম্বে ব্যবস্থা করে নাগরিকদের বিপন্মুক্ত করা, সমীক্ষায় কালক্ষেপ নয়। কলকাতায় তারের জঞ্জালের সমস্যা নতুন নয়। এর আগেও জনজীবনকে তারমুক্ত করার নানাবিধ উদ্যোগের কথা শোনা গিয়েছিল। কমিটি গঠন এবং সমীক্ষাও হয়েছিল। সে সবে উপযুক্ত ফল পাওয়া যায়নি। বিদ্যুতের খুঁটিগুলির ধারণক্ষমতা যা, তারের বোঝা তার চেয়ে কয়েক গুণ বেশি। একই খুঁটির উপর কেব্‌ল এবং ইন্টারনেটের তারও জড়ানো থাকে। ফলে সামান্য ঝড়েই খুঁটি উপড়ে যায়। রাস্তায় বিদ্যুৎবাহী তার ছড়িয়ে পড়ে। প্রতি বর্ষায় ছেঁড়া তারে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে মৃত্যুর ঘটনা সামনে আসে। আমপানে শহরে যত মৃত্যু হয়েছিল, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কারণ ছেঁড়া তারে বিদ্যুৎপৃষ্ট হওয়া। বস্তিগুলিতেও যে ন্যূনতম নিরাপত্তার বন্দোবস্ত না করেই একটি ঘরে অনেকগুলি মিটার বসানো থাকে, সে কথাও পুরসভার অজানা নয়। এর পরেও যে সমীক্ষার প্রয়োজন পড়ছে, সেটাই আশ্চর্যের।

সমস্যা হল, এ শহরের পুর-প্রশাসন আলোচনা এবং সমীক্ষায় যত আস্থা রাখে, কাজের গতির ক্ষেত্রে তত নয়। পুরসভার পক্ষ থেকে কেব্‌ল অপারেটর এবং মাল্টি সিস্টেম অপারেটরদের সঙ্গে বছর সাতেক আগেও আলোচনায় বসা হয়েছিল। মাটির নীচ দিয়ে অপটিক্যাল ফাইবার নিয়ে যাওয়ার কাজ শুরু করার কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু এত দিনেও অনেক জায়গাতেই সেই কাজে গতি আসেনি। অকেজো তারের স্তূপকে গোছা পাকিয়ে ‘ড্রেজ়িং’ করার কাজই বা কত দূর এগিয়েছে? কোনও সভ্য, উন্নত শহরে মাথার উপর ঝুলতে থাকা তারের জঙ্গল দৃশ্যমান হয় না। কলকাতা এখনও এই ক্ষেত্রে যে তার প্রাগৈতিহাসিক দশা কাটিয়ে উঠতে পারল না, তা নিতান্তই লজ্জার।

WBCS BENGALI COMPULSORY PAPER.COM

মাটির কামান

নাগরিকের মানবাধিকার কতটা বিপন্ন, তা রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের দিকে তাকালেই স্পষ্ট হয়। কমিশন কার্যত অস্তিত্বহীন, ন্যূনতম তিন জন সদস্যের কমিশনে দু’জনই নেই, শূন্য রয়েছে সভাপতির পদটিও। গত বছর সভাপতির কার্যকালের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে। আনিস খান হত্যা, রামপুরহাটে অগ্নিসংযোগে গণহত্যার মতো বেশ কিছু মর্মান্তিক ঘটনায় পুলিশের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগাযোগের অভিযোগ উঠেছে। রাজ্য জুড়ে তার প্রতিবাদ চলছে, কিন্তু নীরব দর্শক হয়ে রয়ে গিয়েছে মানবাধিকার কমিশন। সভাপতির অভাবে তদন্ত দল পাঠানোর ক্ষমতা নেই, প্রশাসনিক রিপোর্ট তলব করার এক্তিয়ার নেই। দেশের আইন যে প্রতিষ্ঠানকে নাগরিকের সুরক্ষার দায়িত্ব দিয়েছে, মানবাধিকার লঙ্ঘনের জঘন্যতম নিদর্শনের সম্মুখে সেই কমিশন যদি নীরব দর্শকের ভূমিকা নেয়, তা হলে কোন ভরসায় বাঁচবে রাজ্যবাসী? সংবাদে প্রকাশ, মুখ্যমন্ত্রী ও বিধানসভার স্পিকার মানবাধিকার কমিশনের সভাপতি পদের জন্য যাঁকে মনোনীত করেছিলেন, বিধানসভার বিরোধী নেতা তাঁর নামে আপত্তি করেছেন। নিয়োগে রাজি হননি রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়ও। ফলে অচলাবস্থা চলছে, কবে রাজ্যের মানবাধিকার কমিশন কার্যকর হবে তার কোনও দিশা দেখা যাচ্ছে না। একই ভাবে, লোকায়ুক্তের পদে নিয়োগের জন্য রাজ্যের মনোনীত প্রার্থীকেও ছাড়পত্র দেননি রাজ্যপাল। এই পক্ষাঘাতগ্রস্ত দশা চলছে কয়েক মাস ধরে।

অর্থাৎ মানবাধিকার রক্ষার প্রশ্নেও বিরোধী ও ক্ষমতাসীন দলগুলি যেমন মতৈক্যে পৌঁছতে পারছে না, তেমন রাজ্যপালও তাঁর সাংবিধানিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে অচলাবস্থার নিরসন করছেন না। প্রশ্ন ওঠে, কোন ব্যক্তি নিয়োগ হবেন, কী পদ্ধতিতে নিয়োগ হবে, তা নিয়ে বিরোধ কি মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্যপালের কাছে নাগরিকের সুবিচার পাওয়ার প্রয়োজনের চাইতেও অধিক প্রাধান্য পাবে? এ ভাবে স্বতন্ত্র কমিশনগুলি নিধিরাম সর্দার করে তোলা কেন? আশঙ্কা হয়, রাষ্ট্রক্ষমতা যেন আজ এই বার্তা দিচ্ছে যে, রাজনৈতিক শক্তিই আজ শেষ কথা। তাকে শাসন করার, তার আজ্ঞাধীন পুলিশ-প্রশাসনকে সংযত করার জন্য নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠান হয় নিষ্ক্রিয় হবে, নইলে বশংবদ হয়ে থাকবে। ভয়ানক নানা ঘটনার সম্মুখে মানবাধিকার কমিশন, তথ্যের অধিকার কমিশন, মহিলা কমিশন প্রভৃতির নীরবতা এই সন্দেহকেই ঘনীভূত করেছে যে, সেগুলি নামেই স্বতন্ত্র, কাজের বেলায় সরকার-অনুগামী। যে কমিশনগুলি সক্রিয়, যেমন মহিলা কমিশন বা শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশন, তার সদস্যদের থেকেও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সমালোচনার স্বর শোনা যায়নি। বরং কখনও বিরোধী দল, কখনও কেন্দ্রীয় সরকার বা কেন্দ্রীয় নানা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অভিযোগ শোনা গিয়েছে। রাজ্য সরকারের আধিকারিক বা কর্মীদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির সুপারিশ করেছে কোনও কমিশন, এমন সংবাদও প্রকাশিত হয়নি। বস্তুত অধিকাংশ ক্ষেত্রে গুরুতর অভিযোগগুলির কী নিষ্পত্তি হচ্ছে, নাগরিকের কাছে তা অজানা থেকে যাচ্ছে।

আদালতে বিচার সময়সাপেক্ষ, সেই কারণেই আইন করে স্বতন্ত্র নানা কমিশন নির্মাণ করা হয়েছে। কিন্তু সেগুলি কার্যত নিষ্ক্রিয়। রামপুরহাট অগ্নিকাণ্ডের মতো ভয়ানক নারীহিংসার ঘটনাতেও মহিলা কমিশনের নীরবতা আহত করেছে রাজ্যকে। তথ্যের অধিকার কমিশনে আবেদন করে প্রশাসনের থেকে

তথ্য পেতে বছর ঘুরে যায়, আইন-নির্দিষ্ট সীমা প্রহসন হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে মানুষের আস্থাও কমছে। প্রাক্তন বিচারপতি অসীমকুমার রায় লোকায়ুক্ত থাকাকালীন তিন বছরে মাত্র ত্রিশটি অভিযোগ পেয়েছেন। কমিশনগুলি কালক্রমে হয়ে উঠছে মাটির কামান— প্রদর্শনীর সামগ্রী, ব্যবহারের নয়।

Pollution: দূষণ-নগরী

কলকাতা দ্বিতীয় স্থানে, দিল্লির পরেই। উন্নয়ন নয়, বায়ুদূষণের নিরিখে। বিশ্বের প্রায় সাড়ে ছ'হাজার শহরের উপর একটি আন্তর্জাতিক রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০২১ সালে ভারতের সবচেয়ে দূষিত শহরগুলির মধ্যে দ্বিতীয় ছিল কলকাতা, গোটা বিশ্বে তার জায়গা ২০ নম্বরে। সমীক্ষা থেকে স্পষ্ট, কলকাতার পিএম ২.৫-এর মাত্রা ২০২১ সালে ছিল ৫৯ মাইক্রোগ্রাম। আগের বছরের তুলনায় বৃদ্ধির হার প্রায় ২৬ শতাংশ। দিল্লির তুলনায় এই মাত্রা কম হলেও ভারতের অন্য মেট্রো শহরগুলির তুলনায় তা লক্ষণীয় ভাবে বেশি। এবং বৃদ্ধির হারে তা দিল্লি-সহ অন্য সমস্ত শহরকেই পিছনে ফেলেছে। বিষয়টি গভীর উদ্বেগের। বাতাসে থাকা অতি সূক্ষ্ম কণা পিএম ২.৫ ফুসফুসের গভীরে অনায়াসে প্রবেশ করে, এবং ক্যানসার-সহ নানাবিধ জটিল রোগের সৃষ্টি করতে পারে। বাতাসে এই কণার উপস্থিতি মানবশরীরের পক্ষে সর্বাপেক্ষা ক্ষতিকারক হিসাবে চিহ্নিত। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এই কণার বার্ষিক সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করেছে ৫ মাইক্রোগ্রাম। অর্থাৎ, কলকাতার বাতাসে পিএম ২.৫-এর মাত্রা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্ধারিত মাত্রার তুলনায় প্রায় ১২ গুণ বেশি।

এই পরিসংখ্যান স্তম্ভিত করে দেয়। প্রমাণিত যে, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে বায়ুদূষণের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পেলে বায়ুদূষণের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। সুতরাং, দিল্লি, মুম্বইয়ের ন্যায় বৃহৎ শহরগুলিতে যে বায়ুদূষণ বেশি হবে, তাতে সংশয় নেই। কিন্তু অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিচারে কলকাতা দিল্লি-মুম্বই তো বটেই, ভারতের অন্য অনেক মেট্রো শহরের তুলনাতেও পিছিয়ে। অথচ, দূষণের নিরিখে সে পাল্লা দিচ্ছে দিল্লির সঙ্গে, পিছনে ফেলেছে মুম্বই, বেঙ্গালুরুর মতো শহরকে। পশ্চিমবঙ্গ প্রশাসন যে এই দূষণ বিষয়ে অবহিত নয়, তেমন বলা চলে না। দিল্লির দূষণ প্রসঙ্গ যখনই উঠেছে, বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেছেন কলকাতার দূষণ নিয়েও। ২০২০ সালে কলকাতায় সবচেয়ে দূষিত দিনের সংখ্যা ছিল ৭৪। গত বছরে তা বেড়ে হয়েছে ৮৩। অথচ, বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে তেমন কোনও উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ করা হয়নি। এবং দূষণ প্রতিরোধে যে ব্যবস্থাগুলির কথা প্রশাসনিক তরফে এত দিন জানানো হয়েছে, তাও যে ঠিকমতো কাজ করছে না, সমীক্ষার ফলেই তা স্পষ্ট। এটি জনস্বাস্থ্য নিয়ে চূড়ান্ত সরকারি উদাসীনতা এবং অপদার্থতার উদাহরণ, যা দুর্ভাগ্যজনক ভাবে বছরের পর বছর ধরে চলে আসছে।

এবং এই সমস্যা শুধুমাত্র কলকাতাতেই সীমাবদ্ধ নেই। পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলকেও ক্রমশ বায়ুদূষণ গ্রাস করছে। পরিবেশ বিশেষজ্ঞদের মতে, দূষণ সৃষ্টিকারী শিল্পগুলির উপর যথাযথ নজরদারির অভাবই এর একমাত্র কারণ। জেলাগুলিতে হামেশাই পরিবেশ সংক্রান্ত নিয়ম ভাঙা হয়। বায়ুদূষণ প্রতিরোধে কলকাতা তবু যেটুকু গুরুত্ব পায়, জেলার দূষণের ক্ষেত্রে তার ছিটেফোঁটাও জোটে না। জনস্বাস্থ্যের উপরেও এর প্রভাব প্রত্যক্ষ করা যায়। প্রসঙ্গত, পশ্চিমবঙ্গে ২০১৯ সালে বায়ুদূষণজনিত কারণে যত সংখ্যক মৃত্যু ঘটেছে, ভারতের মধ্যে তা দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। তবুও টনক নড়েনি। বায়ুদূষণে দেশের প্রথম সারিতে স্থান পাওয়ার কৃতিত্ব গৌরবের নয়। কলকাতা এবং পশ্চিমবঙ্গ প্রশাসন যত দ্রুত তা উপলব্ধি করবে, তত মঙ্গল।

WBCS BENGALI COMPULSORY PAPER.COM

এ পরবাসে

হাওড়ার বহুতল আবাসনের ফ্ল্যাটের দরজা ভেঙে বৃদ্ধার পচন ধরা দেহ উদ্ধার হল, মৃত্যুর আনুমানিক তিন দিন পর। বলে দিতে হবে না যে, এই মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে মানুষটির একাকী ও নিঃসঙ্গ অবস্থায়, আপনজনের নৈকট্য ও শুশ্রূষা থেকে দূরে— নয়তো দুঃসংবাদটি জানা যেত আগেই, মৃতদেহের কটু গন্ধ তার বার্তাবহ হত না। একই দিনে

নরেন্দ্রপুরের বাড়ি থেকে উদ্ধার হল আরও এক প্রৌঢ়ার মৃতদেহ। এই ঘটনাটি আরও মর্মান্তিক: মশা তাড়ানোর ধূপ থেকে রাতে বিছানায় আগুন লেগে যায়, ঘুমের মধ্যেই দগ্ধ হয়ে মৃত্যু— মহিলা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হওয়ায় চিৎকার করতে বা কাউকে ডাকতে পর্যন্ত পারেননি। রাতভর জ্বলতে থাকা ধিকিধিকি আগুনের ধোঁয়া দেখে সকালে প্রতিবেশী সবাইকে খবর দেন, তাতে শেষরক্ষা হয়নি।

বার্ধক্য অনিবার্য। ভারতীয় তথা বাঙালি সমাজে বৃদ্ধ মানুষের একা থাকার বাধ্যবাধকতাও ইদানীং ক্রমবর্ধমান। নরেন্দ্রপুর বা হাওড়ার ঘটনা বিক্ষিপ্ত বা ব্যতিক্রমী নয়, গত দু'মাসে হাওড়াতেই একাকী অবস্থায় মৃত্যুর ঘটনা এই নিয়ে তিনটি ঘটল। একাকী বৃদ্ধবৃদ্ধাদের অস্তিত্ব কেবল সমাজের উচ্চবিত্ত স্তরে, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তের ঘন সংবদ্ধ পারিবারিকতা বার্ধক্যকে নিঃসঙ্গ হতে দেয় না— এমন একটি ধারণা আগে চালু ছিল। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, বয়স্ক মানুষের একা থাকা ও একাকী অবস্থায় মৃত্যু সামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে নিয়মিত ঘটনা: হাওড়ার বৃদ্ধা মহিলা অন্যের বাড়িতে রান্নার কাজ করতেন, নিজের বাড়িতে থাকতেন একা। নরেন্দ্রপুরের প্রৌঢ়ার মেয়ে কাছেই থাকতেন, কিন্তু এক বাড়িতে নয়। একই ছাদের তলায়, পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে থাকা মানেই যে একাকিত্ব বা অবসাদ গ্রাস করবে না তা নয়, কিন্তু একা থাকা বয়স্ক মানুষের একাকিত্বের বিপদ স্বাভাবিক ভাবেই বেশি। আধুনিক নগরজীবনে ক্রমশ 'পাড়া সংস্কৃতি'র দখল নিয়েছে তথাকথিত 'ফ্ল্যাট কালচার', একক বা গুচ্ছ বহুতল আবাসনগুলিতে জীবন নির্বাহের যাবতীয় সুযোগসুবিধা, বিলাস-ব্যবস্থা, রান্না ও চিকিৎসা পরিষেবা, সর্বোপরি নিরাপত্তার সুবন্দোবস্ত থাকায় প্রবাসে, দূরে বা অন্যত্র থাকা সন্তানপ্রজন্ম মনে করছে, বাবা-মা একা আছেন ঠিকই, কিন্তু একাকী নন। তবু মহানগর থেকে মফস্সলে দরজা ভেঙে উদ্ধার-হওয়া মৃতদেহগুলি প্রমাণ করে, নিঃসঙ্গ বার্ধক্য এক সামাজিক অভিসম্পাত। স্মার্টফোন, আন্তর্জাল, আধুনিকতম প্রযুক্তিতে সেই শাপমোচন হয় না।

অতিমারি এই পরিস্থিতিকে গুরুতর করে তুলেছে কি না, তা নিয়ে কথা হওয়া দরকার। বিগত দু'টি বছরে মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও কর্মজীবনে আমূল বদল এসেছে। স্বাস্থ্য-দুর্যোগের জেরে বহু মানুষ ঘরে ফিরতে পারেননি, আবার আপাত-স্বাভাবিকতার আবহে এখন দূরে কর্মস্থলে ফিরছেন অগণিত জন। দুই পরিস্থিতিতেই বিচ্ছেদ এক অমোঘ ধ্রুবক, তার শিকার হচ্ছেন বয়স্ক মানুষেরা, অতিমারির আঘাত ও কর্মমুখর ব্যস্ত জীবন থেকে দূরত্ব তাঁদের শরীর-মনের যন্ত্রণা বাড়িয়ে দিচ্ছে আরও। যুক্তি ও প্রযুক্তিকে আঁকড়ে ধরা, ধ্রুপদী পারিবারিকতা থেকে মুখ ঘোরানো এই সময়ের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে না পেরে বয়স্করা ক্রমশ গুটিয়ে নিচ্ছেন নিজেদের, স্বগৃহে পরবাসে। সকলেই হয়তো নন, কিন্তু অনেকেই। নয়তো এই করুণ অসহায় মৃত্যুসংবাদগুলি সংবাদপত্রের পাতায় নিয়মিত খবর হয়ে উঠে আসত না।

খাবারে টান

এক বেলা ভরপেট পুষ্টিকর খাবারের মূল্য দরিদ্র পরিবারের শিশুর কাছে কম নয়। এ কথা অনস্বীকার্য যে, ওই নিশ্চিত খাবারটুকুর টানই বহু পড়ুয়াকে নিয়মিত স্কুলে নিয়ে যাচ্ছে। স্কুলগুলিতে সরকারি মিড-ডে মিল প্রকল্পের সূচনার পিছনে শিশুর পুষ্টি নিশ্চিত করার পাশাপাশি সেই উদ্দেশ্যটিও ছিল। কিন্তু প্রায়শই দেখা গিয়েছে, যে পুষ্টির কথা ভেবে মিড-ডে মিলের খাদ্যতালিকা রচিত হয়েছিল এবং বাস্তবে তাদের পাতে যা পড়ে— দুইয়ের মধ্যে দূরত্ব বিপুল। সম্প্রতি যেমন বাজার অগ্নিমূল্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশুদের পাতে ডিম, ডালের দেখা মেলাই দুষ্কর হয়ে উঠেছে। নয়তো আপস করতে হচ্ছে খাবারের মানের সঙ্গে। সপ্তাহে দু'দিন ডিমের বদলে এক দিন করে জুটছে। যে দিন ভাত, ডালের সঙ্গে সয়াবিন থাকার কথা, সে দিন ডাল অনুপস্থিত থাকছে। অর্থাৎ, শিশুর পুষ্টির ভান্ডারটি অপূর্ণই থেকে যাচ্ছে।

কেন খাবারে টান, বুঝতে গেলে বাজারে খাদ্যবস্তুর দাম এবং মিড-ডে মিলে শিশুপ্রতি বরাদ্দের দিকে চোখ রাখতে হয়। বর্তমানে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ুয়া প্রতি দৈনিক বরাদ্দ চার টাকা সাতানব্বই পয়সা। এবং ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ুয়া প্রতি দৈনিক বরাদ্দ সাত টাকা পঁয়তাল্লিশ পয়সা। অন্য দিকে, বাজারে একটা ডিমের দামই পাঁচ থেকে সাড়ে পাঁচ টাকা। মিড-ডে মিলের চালটুকু পাওয়া যায় বিনামূল্যে। বাকি আনাজ, রান্নার তেল, মশলাপাতি, এমনকি রান্নার গ্যাসের দামও যে ভাবে বেড়েছে, তাতে কুলিয়ে ওঠা অসম্ভব। সুতরাং স্বাভাবিক বুদ্ধি বলে, বরাদ্দ বৃদ্ধি অবিলম্বে প্রয়োজন। বর্তমানে এই প্রকল্পে চাল বাবদ কেন্দ্রের বরাদ্দ ১০০ শতাংশ। রান্নার অন্যান্য সামগ্রী খাতে বরাদ্দের মধ্যে কেন্দ্রের ভাগ ৬০ শতাংশ, এবং রাজ্যের ৪০ শতাংশ। অর্থাৎ, পড়ুয়াদের পুষ্টির দায়িত্ব প্রায় সমান ভাবেই দুই সরকারের উপর বর্তায়। অথচ, মিড-ডে মিলে বরাদ্দ বৃদ্ধির প্রসঙ্গ উঠলেই পারস্পরিক দোষারোপের পর্ব শুরু হয়। উপেক্ষিত হয় শিশুকল্যাণের বিষয়টি। শিশুদের ভোট নেই, ভুললে চলবে না।

মনে রাখা দরকার যে, মিড-ডে মিলের সঙ্গে খাদ্যের অধিকারের প্রশ্নটি জড়িয়ে। আর শিশুর খাদ্যের অধিকার বলতে সে যাতে পর্যাপ্ত সুষম খাদ্য পায়, সেটা নিশ্চিত করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। অথচ, এই কাজেই বিরাট ফাঁক থেকে যাচ্ছে। অতিমারিতে দীর্ঘ কাল প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণির জন্য স্কুল বন্ধ থাকায় এই রাজ্যে শিক্ষার পাশাপাশি পুষ্টির ক্ষেত্রেও লক্ষণীয় ঘাটতি থেকে গিয়েছে। লকডাউন চলাকালীন শুকনো খাবার হিসাবে তাদের হাতে যা তুলে দেওয়া হয়েছে, প্রয়োজনের তুলনায় তা অনেক কম। স্কুল খোলার পর দেখা গিয়েছে মিড-ডে মিলের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। অনেক পরিবারের আয় হ্রাস পাওয়ায় স্কুলে প্রদেয় খাবারের উপর নির্ভরতা বেড়েছে। এমতাবস্থায় স্কুলগুলি এই বাড়তি চাহিদা সামাল দেবে কী উপায়ে? অনেক সময় স্কুলের পুষ্টি-বাগান বা শিক্ষকদের নিজস্ব ফান্ড থেকে ঘাটতি পূরণের চেষ্টা করা হলেও, এই সকল প্রশংসনীয় উদ্যোগ সরকারের দায়িত্বের বিকল্প হতে পারে না। সরকারকে বাজারমূল্য অনুসারেই পড়ুয়াদের বরাদ্দ স্থির করতে হবে। প্রয়োজনে স্কুলগুলির হাতে অগ্রিম অর্থ প্রদান করতে হবে। বিষয় যখন শিশুস্বাস্থ্য, তখন কোনও মূল্যেই তার সঙ্গে আপস চলতে পারে না।

WBCS BENGALI COMPULSORY PAPER.COM